শ্রম-শ্রমিক এবং কিছু কথা

আজ ভারতের যা অবস্থা তাতে পুরো আবহাওয়াটাই শ্রম এবং শ্রমিক বিরোধী হয়ে উঠেছে। শ্রমিক সংগঠনগুলো 'কনসিলিয়ারি এজেন্সি' হিসেবে কাজ করার বদলে আজ প্রায়ই শ্রম-বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। চালু আইনে শ্রমিকদের যে সমস্ত সুরক্ষা পাওয়ার কথা, সেই সুরক্ষা কতটা সত্যি সত্যি শ্রমিকরা এখন পাচ্ছেন তা নিয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন বোধহয় কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর আর নেই। ফ্যাক্টরি ইনসপেক্টর-এর কাহিনীটি চমৎকার। প্রতি ১০০০ টা কারখানা পিছু মোটে একজন ইনসপেক্টর! অন্য ক্ষেত্রেও, যেমন, ফুড ইনসপেক্টরের ক্ষেত্রেও অবস্থা তথৈবচ। অথচ আজ পর্যন্ত কোনো ট্রেড ইউনিয়ন দাবি করলো না যে শ্রম এবং শ্রম সংক্রান্ত সমস্ত কিছু আইনমাফিক চলছে কিনা তা দেখার জন্য ফ্যাক্টরি ইনসপেক্টরের সংখ্যা বাড়ানো হোক অথবা /এবং ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদেরও এই নজরদারীর টিমে-এর নেওয়া হোক।

এই সব দেখে যদি শ্রমিক আজকে সংগঠিত শক্তির ওপর ভরসা হারিয়ে অনেক বেশি আইন-নির্ভর হয়ে ওঠে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে! কিন্তু শ্রমিকের 'সুবিধার' জন্য আইনের সংখ্যা অনেক, কোন শ্রমিককে কখন কোন আদালত কোন আইনের আওতায় আনবে তা হাকিম সাহেব এবং 'দেবা জানন্তি'! শ্রমিক বেচারা পড়ে 'আইডেনটিটি ক্রাইসিস'-এ। এই আইডেনটিটি ক্রাইসিসের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ হলো অসংগঠিত শ্রমিকরা। এদেরকে ঠিক কেন অসংগঠিত বলা হবে তা-র কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা কোনও আইন এখনও দিয়ে উঠতে পারেনি।

যে সুবিধা আইন-মোতাবেক শ্রমিকের পাওয়ার হক রয়েছে তা অবস্থা কেমন? উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ন অঞ্চলে ই এস আই এর সুবিধা এখনও অমিল। ই এস আই সংক্রান্ত পরিকাঠামো সরকার আজও তৈরি করে উঠতে পারেনি। তাই ই এস আই-এর আওতায় আসতে পারেন এমন এক বিরাট সংখ্যক শ্রমিক

আইনী সুরক্ষা থেকে বেআইনীভাবে বঞ্চিত। চা বাগানগুলোর দুর্দশা কহতব্য নয়, বেশির ভাগই হয় বন্ধ নয় রুগ্ন, বেশির ভাগ বাগানে খাওয়ার জলই অমিল। তাই নিয়েই যখন ইউনিয়নগুলোর হেলদোল নেই তো শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদির কথা তো ট্রেড ইউনিলগুলো গোটাগুটি ভুলে মেরে দেওয়ারই কথা। এহেন চা বাগানের শ্রমিকরা ন্যায়বিচারের শিবঠাকুরের আপন দেশে এক সর্বনাশা আইনের কোপে ই এস আই-এর আওতার বাইরে। অপিচ, আইনমতে, সমস্ত কর্মচারি, এমনকি কৃষি, অসংগঠিত শ্রমিকবৃন্দও ই এস আই-ভুক্ত হতে পারে!

পরিষেবা ক্ষেত্রটিতে পরিপূর্ণ ম্যাৎস্যন্যায় চলছে। ক্যুরিয়র কম্পানির শ্রমিক, শপিং মল, আইটিইএস-এর কর্মীবৃন্দ বা সুপার স্পেসালিটি হাসপাতালের কর্মীদের জন্য কোনো ইউনিয়ন নেই আজও। সেক্টর-ফাইভ-এ গণতান্ত্রিক যুব ফেডরেসনের প্রাক্তন সভাপতির ‘নেতৃত্বে’ একটি ইউনিয়ন হয়েছে বলে সম্প্রতি শোনা গেলেও সেই ইউনিয়নের মূল ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ রয়েছে ‘শিল্পায়ন-বিরোধী’-দের একহাত নেওয়ার জন্য অথবা বিরোধীদের ডাকা বনধে আইটি সেক্টর চালু রাখার বিপ্লবী কাজের মধ্যেই। এতদ সত্বেও যাদবপুরের ছাত্রদের ওপর পুলিশী তাণ্ডবে শুধু শহর কলকাতার সেক্টর ফাইভ-ই নয়, আইটি-র সদর দপ্তর, সেই সাধের ব্যাঙ্গালুরুতেও সেই দুপুরে পুলিশকে ধিক্কার জানিয়ে আইটি কর্মীদের মিছিল হয়েছিলো।

শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের খাস তালুকের সামান্য হালহকিকৎ তালাশ করা যেতে পারে। ১৫ বছর ঘুরতে চললো অথচ গ্র্যাচুইটি পাননি এমন শ্রমিকের সংখ্যা এই রাজ্যে দু-দশটা নয়, হাজারে হাজারে। শ্রমিকদের পিএফ বাকি রাখছে এবং এই অপরাধে অপরাধীরা শাস্তি পাচ্ছে না এমন রাজ্যের মধ্যে আমাদের সোনার বাংলার স্থান দ্বিতীয় - স্বভাবতই কোনো একটি অ-বাম শাসিত রাজ্য এই বিষয়ে আমাদের টেক্কা দিয়েছে।২০০৭ পর্যন্ত হিসেব মতে এই শিল্পায়ন-বান্ধব রাজ্যে শ্রমিকের হকের যতখানি পি এফ-এর টাকা মালিকরা দেয়নি তার পরিমান হলো ১৬১.৫২ কোটি টাকা - এর মধ্যে রাজ্য

সরকারি সংস্থার বকেয়ার পরিমান হলো ২৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ রাজ্য সরকারও প্রায় একের ছয় ভাগের কিছু বেশি টাকা বাকি রেখেছে। এই রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থা ই এস আই বাবদে বাকি রেখেছে ১৭৩.৭৩ কোটি টাকা। এই বিষয়েও আমরা সারা দেশের নিরিখে রৌপ্য পদক পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে। আইন মতে এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ শ্রম-আইন ভঙ্গের সমতুল্য। সিআইটিইউ নেতা কালী ঘোষ মহাশয় প্রকাশ্যে বলেছেন যে ‘ এই রাজ্যেও শ্রম আইন লঙ্ঘনের বিষয়ে আমরা অবহিত, এই বিষয়টিকে ঠিক ব্যতিক্রম আর বলা যাচ্ছে না। আমরা ইতিমধ্যেই রাজ্যের সঙ্গে কথা বলেছি। রাজ্য আশ্বাস দিয়েছে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।‘ ব্যবস্থাটা বোধকরি অদৃশ্য কোনও ব্যবস্থা - গত তিরিশ বছরেও তা দৃশ্যমান হলো না।

এই রাজ্য অদূর অতীতে বিড়ি, কৃষি, পাউরুটি, ইটভাটা, সিনেমা, ডালকল, ডেকরেটর্স ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় ৫০ টি শিল্পকে ন্যূনতম মজুরির আওতায় এনেছে। ব্যতিক্রম না থাকলে যে নিয়ম প্রতিপন্ন হয়না - এই বৈজ্ঞানিক সূত্রকে মান্যতা দিতেই নিয়মটি নিয়ম করেই মানা হয়না। যেমন মুর্শিদাবাদ জেলার জন্য বিড়ি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বেঁধে দেওয়া হয়েছে প্রতি ১০০০ বিড়ি বাঁধার জন্য ৯২ টাকা ২০ পয়সা। কিন্তু এই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি মজুরি দেওয়া হয় ৪১ টাকা ২০ পয়সা। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এই কাজের জন্য সরকার-নির্দিষ্ট হার হল ১০৯ টাকা। কিন্তু পুরুষরা পান ৪০ টাকা আর মহিলারা পান ৩০ টাকা। কালী বাবু কী বলেন?

ক্যানিং-এর অবস্থা আরও শোচনীয়। এখানে আবার সরকার-বিরোধীদের আপেক্ষিক শক্তি বেশী। ফলে সরকারের পক্ষে ‘দেখে নেওয়ার‘ দায় বর্তেছে বোধহয়। এখানে ইটভাটার একজন দক্ষ শ্রমিকের মাস গেলে পাওয়ার কথা ৩৪৭২ টাকা, কিন্তু তাঁরা হাতে পান ২৪৫০ টাকা। নেপোয় মারে দই। এখানেই অ-দক্ষ শ্রমিকের পাওয়ার কথা দিনে ১২২ টাকা, দেওয়া হয় ৭০ টাকা। এই অঞ্চলে অন্তত একটি ডজন কৃষক-শ্রমিক ইউনিয়ন আছে - মহাসমারোহে শেষ ভারত বনধটি পুরোপুরি সফলও হয়েছে।

রিষড়ার বন্ধ কারখানা - শ্রী ইঞ্জিনিয়ারিং। এই কারখানার তিনজন কর্মী কোর্ট-কাছারি শ্রম-কমিশানার প্রভৃতি বহু জায়গায় ঘুরে, হয়রান হয়ে জুতোর অবশিষ্ট সুকতলাটুকু খুইয়ে শেষ পর্যন্ত শ্রম কমিশনারের কাছ থেকে গ্র্যাচুইটির টাকা পাওয়ার আদেশ আদায় করতে সক্ষম হলেন। এই আদেশ এসেছিল কারখানা বন্ধ হওয়ার চার বছর পর, আদেশ আসার পরও চার বছর অতিক্রান্ত, কিন্তু আজও সেই টাকা শ্রমিকরা পাননি। তবে কিনা শ্রমিকের জান বলে কথা, তাই তাঁরা আজও জিন্দা আছেন। খড়দহের ক্যালক্যাটা স্টিলের এক শ্রমিক তাঁর ৬১ বছর বয়সে, ১৯৯৮ সালে (উন্নত বামফ্রন্ট আসেনি তখন) গ্র্যাচুইটির জন্য শ্রম দপ্তরে আবেদন করেছেন, এখন তাঁর বয়স ৭০ বছর, অথর্ব, আগের মতো ঘোরাঘুরির বয়স আর নেই। স্বভাবতই তদ্বিরের অভাবে কেসটি দীর্ঘ এক দশক নড়ছে-চড়ছে না।

এহেন অবস্থায় সরকার আবার ক্যাসুয়াল শ্রমিক নিয়োগ করছে। সিঙ্গুরের ৮০ জন ছাঁটাই কর্মীরা টেকনিক্যালি ডবলু বি আই ডি সি-র শ্রমিক হওয়ার কথা - কেননা তাঁরা আই টি আই-এর ট্রেনিং নিয়েছিলেন ডবলু বি আই ডি সি-র সঙ্গে 'মৌ'-চুক্তির মাধ্যমে। পাকা কর্মীরা যেখানে বঞ্চিত হচ্ছেন সেখানে 'কাঁচা' কর্মীদের দাবি আদায়ে কে-ই বা উদ্যোগ নেবে!